

ପ୍ରିୟ ଜିତିମ୍ମ ପ୍ରିୟ ଦାତ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

କାବିତା

ଗଳ୍ପ । ଇତିହାସ । ଚେତନା

এক.

মুসআব ওর ভাই ফুআদকে বললো :

—‘শিক্ষক যা বলেছেন ঠিক বলেছেন; প্রিয় জিনিসই দান করতে হবে আমাদেরকে ।’

ফুআদ প্রতিবাদ করে উঠলো । ওর কথা কেটে বললো :

—‘হুহ, বললেই হলো নাকি! তাহলে তো প্রাসাদের সব সুন্দর জিনিস দান করে দিতে হবে—কিছু রাখা যাবে না আমাদের কাছে । আমাদের এই সুন্দর সুরম্য দৃষ্টিকাড়া প্রাসাদটাও কাউকে দিয়ে দিতে হবে । এমনকি আমাদের মার্সিডিজ গাড়িটাও দান করে দিতে হবে । এ সব কিছুই তো আমরা ভালোবাসি! স-ব আমাদের প্রিয় প্রিয় জিনিস! তাই নয় কি মুসআব? এখনও বলবে কি—উসামা সাহেব ঠিক বলেছেন? ..’

মুসআব বললো :

—‘না তো! এমনটা আমি মোটেই বলতে চাই নি । কে বলেছে—প্রাসাদের সব প্রিয় জিনিস বিলিয়ে দিতে হবে? তুমি একটু বেশিই বুঝে ফেলেছো ।’

ফুআদ বিদ্রূপ কণ্ঠে বললো :

—‘আমি বেশি বুঝি নি । শিক্ষক কি তা-ই বোঝাতে চান নি?’

মুসআব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো :

—‘না ফুআদ, মোটেই না । শিক্ষক ক্লাসে প্রিয় জিনিস দানের আয়াতটি শুধু ব্যাখ্যা করছিলেন :

‘তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবেই না,
প্রিয় প্রিয় জিনিস থেকে কিছু
দান না-করলে ।’

[আলে ইমরান : ১৪০]



এগারো.

দুই ভাইয়ের মাঝে আজ বাতি বন্ধ করা নিয়ে কোনো 'ঝগড়া' হলো না। মুসআব বাতি বন্ধ করে শুয়ে পড়লো। ফুআদও তাকে অনুসরণ করলো।

মুসআব অবাক! অবাক বুঝি ফুআদও। এমন তো আগে কখনও হয় নি। আজ হয়েছে। আগামীকালও কি হবে? সব সময়? জানে না মুসআব। ও শুধু জানে—আজ হয়েছে। 'আজ' নিয়েই ও খুশি থাকতে চায়। মুসআব ভেতরে ভেতরে আলোড়িত হচ্ছে। আন্দোলিত হচ্ছে। শিহরিত হচ্ছে। একটা অপার্থিব আনন্দে ভাসছে। একটু পর ফুআদকে বললো :

—'ফুআদ, আমি কিন্তু ককখনও তোমার ব্যাপারে হতাশ ছিলাম না। উসামা সাহেব তোমার কথা কণ্ঠে বলেন! তোমাকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন। সব সময় দুআ করেন তোমার বৈভিক (বিভাময়, আলোকময়) ভবিষ্যতের। জানো, আমি সব সময় আশায় বুক বাঁধতে শিখেছি এই উসামা সাহেবের কাছ থেকেই। আশ্চর্য ভালো মানুষ তিনি। মানুষ গড়ার দক্ষ কারিগর। কল্যাণকামী। নিজের, সমাজের, রাষ্ট্রের, সবার।

ফুআদ, একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবায়। আমি ভাবি, ভেবেই চলি—কী করে আমরা পরিবারের সবাই জান্নাতের আলিশান বালাখানায় একসাথে থাকতে পারবো। যেমন থাকি আমাদের এ-'বালাখানা'য়। কিন্তু জান্নাতের বালাখানা এরচেয়ে আরও 'অকল্পনীয়' সুন্দর ও দামি হবে! দু'য়ের ভেতর কোনো তুলনাই চলে না। ..'

ফুআদ তন্ময়চিন্তে মুসআবকে আজ শুনতে থাকে। ওর কথা আজ এতো ভালো লাগছে কেনো? ফুআদ বিস্ময় ও মুগ্ধতা ধরে রাখতে পারে না, বলে ওঠে মুগ্ধ কণ্ঠে :

—'মুসআব, কিন্তু জান্নাতের সেই বালাখানা কেমনে পাবো আমরা—হাণ্ডা তুন্ফিকু মিন্মা তুহিব্বুন!'

মুসআব অন্ধকারেই যেনো দেখতে পেলো—ফুআদ মিষ্টি করে হাসছে। সে-হাসিতে মিশে আছে ওই দিনের স্মৃতি। মুসআব বললো :

—'ঠিক বলেছো ফুআদ, হাণ্ডা তুন্ফিকু মিন্মা তুহিব্বুন। প্রিয় জিনিস .. প্রিয় দান।'

বারো.

মিনারচূড়া থেকে ভেসে আসছে ফজরের মিষ্টি আজান। মুসআব বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেলো। অজু করলো। ফুআদকে ডাকলো। একবার। দুইবার। তিনবার। কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ফুআদ। মুসআব ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে ভাবলো—একটু

পানি ছিটিয়ে দেবো কি! কিন্তু উলটো প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় বিরত থাকলো। মুসআব ভাবলো—আজ আব্দু-আম্মুকেও ডাকবে; যদি ওঠেন! কিন্তু বাবা রেগে যেতে পারেন। শেষ পর্যন্ত মুসআব সাহস করতে পারলো না; একাই গেলো মসজিদে।

ফিরে এসে কুরআন তিলাওয়াত করলো। এক পারা। তিলাওয়াতে মনটা ছিলো আজ বেশিই ভেজা ভেজা। চোখ ছিলো ছলোছলো। অমন তো কখনও হয় না! মুসআব হাত তুললো আকাশের দিকে। দরদর করে কাঁদতে লাগলো :

‘আল্লাহ, আমার আল্লাহ, আব্দু-আম্মুকে হিদায়াত করো! নামাজী বানিয়ে দাও! পরহেজগার করে দাও!

আল্লাহ, আমার ভাইটিকে পথ দেখাও—তোমাকে চেনার পথ! তুমি পথ না-দেখালে কীভাবে পাবো আমরা পথ?

আল্লাহ, আমার সাত বছরের বোনটা যেনো ছোটো থেকেই দ্বীনমুখী হয়ে ওঠে। আমাদের সবাইকে তুমি দ্বীনের ছায়ায় বসতে দাও! বড়ো হতে দাও! এ-ছায়ায় বসে বসেই আমরা এ-পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই। তারপর দুনিয়ার সফর শেষ করে বসবো গিয়ে জান্নাতের আরামের ছায়ায়। আহা, সে-ছায়া কী ছায়াদার ও মমতাভরা হবে। চারদিকের দৃশ্যাবলি কী অকল্পনীয় দৃষ্টিকান্ড হবে। বয়ে যাবে ঝরনাধারা। অফুরান নেয়ামতের মাঝে শুরু করবো আমরা অফুরন্ত জীবন। ওখানে বয়ে যাবে নায-নেয়ামতের কী অনিঃশেষ ধারা। বিরাট রাজত্ব হবে আমাদের।

আল্লাহ, গোল হয়ে আমরা বসে থাকবো আরাম-আসনে আর চির-কিশোরেরা ঘুরে ঘুরে আমাদের পরিবেশন করবে পান পাত্র! ..

আল্লাহ, আমাদের ধন্য করো
সেই অফুরন্ত সুখ শান্তির
অমর জীবন দান করে!
আমাদের সবাইকে সে-জীবনের
যোগ্য করে দাও!
দাও হে আল্লাহ!
দাও! দাও!
তুমি-না মহা-দাতা,
হে আল্লাহ!’



—‘প্রতি বছর?’

—‘প্রতি বছর, ইনশা আল্লাহ ।’

সবাই একসঙ্গে হঠাৎ পেছনে তাকালো । সাত বছরের বোন হিবা আসছে চোখ কচলাতে কচলাতে । এইমাত্র ওর ঘুম ভেঙেছে । ফুআদ তাকালো আবার বাবার মুখের দিকে । বাবাও মায়ের মতো ছলোছলো দৃষ্টি নিয়ে হাসছেন শিশুর হাসি । তৃপ্তির হাসি । তারপর সবাইকে লক্ষ করে বলে উঠলেন :

—‘আমি বুঝি ‘না’ বলবো! হতেই পারে না! আমি তোমাদের একলা ‘ভালো’ হতে দেবো না । এ-বছর থেকে আমিও দেবো যাকাত । পড়বো নামাজ ।’

আঠারো.

একটু পর বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে মুসআব ও ফুআদ আলীর হাতে তুলে দিলো নিজেদের উপহার ।

আলী অবাক! মালী চাচাও অবাক! বাবা-মা আর দু-ভাইয়ের মুখে হাসি—দানের মহিমায় ভাস্বর সে-হাসি । কিন্তু মালী চাচা কাঁদছেন । আলীর চোখেও পানি । খুশির কান্না । তৃপ্তির হাসি । এদিকে হঠাৎ ফুআদের চোখেও দরদর করে নেমে এলো অশ্রু । ওই জানালাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফুআদ কাঁদছে, নীরবে—একটু আড়াল খুঁজে নিয়ে ।

কেউ জানতে পারলো না—এ-কান্নার রহস্য কী! কে এখন বলে দেবে সবাইকে—এ-কান্না আসলে একটি সুন্দর চডুই পাখির জন্যে!



দানের আকাঙ্ক্ষা ঝরে ঝরে

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

কোনো সমাধান আসবেই। সহৃদয় মানুষের দেখা মিলবেই, যার কাছে পাওয়া যাবে খাবার ও পানীয়। এই ধূসর মরুতে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট পাবে আল্লাহর মেহমানেরা, সে তো হয় না।

বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর হঠাৎ থেমে গেলেন। সাথীদের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন :

—‘দেখো দেখো, ওই যে একটা তাঁবু। তাই না? ওই দেখো, তাঁবুর মুখেই বসে আছেন এক বৃদ্ধা। আমি কি বলি নি—বিপদ ঘূচবেই, সাহায্য আসবেই?’

হাসান-হোসাইন সমর্থন করে বললেন :

—‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। চলো, ওখানেই যাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষুধা নিবারণের কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন।’

তারা বৃদ্ধার তাঁবুর নিকটবর্তী হতেই বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা তাদের চোখ-মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে ফেললেন। মরুভূমি রক্ষ হলেও মরুভূমির মানুষ বুঝি একটু বেশিই দয়ালু হয়। বৃদ্ধার হৃদয়ে মমতার বান ডেকে গেলো। তার মাতৃ-হৃদয়ে মমতাভরা প্রশ্ন সৃষ্টি হলো—কারা এই নূরানী চেহারার যুবকেরা? এই মরু-পরিবেশে কেনো তারা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে? তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চাইলেন :

—‘তোমরা এখানে? কোথেকে?’

—‘আমরা কুরাইশ-গোত্রের। সংকটে পড়েছি, ভীষণ পাথেয়-সংকটে। আপনার কাছে পান করার মতো কিছু আছে?’

বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে একটি বকরি উপস্থিত করলেন। বললেন :

—‘এটি দোহন করে দিচ্ছি, দুধ পান করো।’



ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে, আর সইতে পারছি না।’

স্ত্রী অবাক কণ্ঠে বললেন :

—‘আপনি হজে যাবেন? কিন্তু রাহাখরচ—পাথেয়? কিছুই তো নেই আপনার! তা ছাড়া আপনার সন্তানেরা ছোটো। আপনি না-থাকলে কে এদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে? ফিরতে তো অনেক সময় লাগবে।’

স্ত্রীর কথায় যুক্তি ছিলো। কিন্তু মন তো মানছে না। ঝড় তো থামছে না। কাছে ডাকলেন ছেলেদের। হাত রাখলেন ওদের মাথায়। বললেন অশ্রু-আবেগের ভাষায় :

—‘বৎসরা, আমাকে একটু যেতে দাও-না বাইতুল্লাহ যিয়ারতে! ওখানে গিয়ে আমি তোমাদের জন্যে অনেক দুআ করবো। দেখবে—তোমাদের তখন কোনো সমস্যাই থাকবে না।’

কিন্তু ছেলেদের কণ্ঠেও বেজে উঠলো মায়ের সুর :

—‘কিন্তু বাবা, যাবেন কী করে? কোথায় পাবেন পথ-খরচ? তা ছাড়া আপনি চলে গেলে আমরা একা হয়ে যাবো না? আয়-রোজগার ও খাবার-দাবারের কী ব্যবস্থা হবে? ঘরে তো তেমন কিছুই নেই!’

ছেলেদের কথায় তার মনটা সাঁঝ-আকাশের মতো মলিন হয়ে গেলো। তিনি মাথা নিচু করে নীরবে বসে রইলেন।

হঠাৎ যেনো সাঁঝের নিচে একটা আলোকস্নাত চাঁদ ঢাকা পড়ে গেলো। একটু পর সাঁঝ সাঁঝ চেহারাটায় নেমে এলো বৃষ্টি বৃষ্টি অশ্রুধারা। ছেলেরা বাবার অশ্রুর সামনে বিচলিত হলো। বিগলিত হলো। ছলোছলো চোখে নীরবে তাকিয়ে রইলো।

পাশেই ছিলো তার ছোটো মেয়েটি। ওর চোখও ছলছল করে উঠলো। যেনো সেখানে লুকিয়ে আছে আকাশভরা বৃষ্টি। সে ছলোছলো চোখে .. থরোথরো ঠোঁটে .. কান্নাভেজা কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো :

—‘আব্বুকে যেতে দাও-না! কী হয় যেতে দিলে? আব্বু হজে গেলে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।’

সবাই বললো :

—‘কিন্তু আব্বু মক্কায় চলে গেলে আমাদের উপায়? কোথেকে খাবার আসবে?’

ছোটো মেয়েটি এবার উত্তর দিলো বড়ো মানুষের মতো :

—‘আব্বুকে যেতে দাও! কেনো খাবারের ভয়ে আমরা তার মুবারক সফরের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো? আমাদের রিজিকদাতা তো আল্লাহ! তিনি সর্বশক্তিমান। অবশ্যই

আমরা না-খেয়ে মরবো না।’

কচি মুখে উচ্চারিত হলেও যুক্তি ছিলো অকাট্য—শক্ত। তাই কেউ ওর বিপক্ষে কিছু আর বলতে পারলো না, বরং তার বুদ্ধিমত্তা, ঈমানের দৃঢ়তা ও একিনের গভীরতার কাছে সবাই লজ্জা পেলো। ভাইয়েরাও এবার অভিন্ন কণ্ঠে বললো :

—‘আব্বু, ও সত্যি বলেছে। আমরাই ভুলের মধ্যে আছি। আপনি বরং ‘আল্লাহ ভরসা’ করে রওনা হয়ে যান। আমাদের নিয়ে কিছুই ভাবতে হবে না। আল্লাহই আমাদের দেখবেন। আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। অবশ্যই করবেন।’

স্বীর কণ্ঠেও এখন বিগলিত আবেগ। তিনিও স্বামীর সফরের পক্ষে, বরং অশ্রু অশ্রু চোখে তিনিই সবার আগে তাকে আসন্ন সফরের জন্যে ‘বিদায়ী মুবারকবাদ’ জানালেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মতো তিনি অতোটা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারলেন না।

আনন্দে হাতিম আলআসামের চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তিনি আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেদের। ছোটো মেয়েটাকে সঙ্গেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওদের জন্যে বরকতের দুআ করলেন। স্বীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর হাতের নাগালে যা ছিলো, তা-ই দিয়ে একটা গাঠুরি বাঁধলেন।

তারপর সবাইকে প্রয়োজনীয় নসিহত করে
রওনা হয়ে গেলেন বাইতুল্লাহর মুসাফির
বাইতুল্লাহর পথে—
এক কাফেলার সঙ্গে।



দানবীরদের মেলা

কয়েক বন্ধুতে কথা হচ্ছিলো এক ঘরোয়া পরিবেশে। যার গৃহে এই আসর, হঠাৎ তিনি অন্যদের কাছে জানতে চাইলেন :

—‘বলো তো দেখি, বর্তমানে সবচেয়ে বড়ো দানশীল কে?’

কোনো প্রসঙ্গ ছাড়া হঠাৎ এই প্রশ্নে অন্যেরা বেশ অবাক হলো। আসরের একজন উত্তর দিলো :

—‘কেনো, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালেব! আমার বিবেচনায় তিনিই বর্তমানে শ্রেষ্ঠ দানশীল।’

আরেকজন বললো :

—‘না, আমার মতে শ্রেষ্ঠ দানশীল ব্যক্তিটি হলেন আরাবা আলআওসী। দেখো— এক কবি তার দানশীলতা নিয়ে কী সুন্দর বলেছেন :

رَأَيْتُ عَرَابَةَ الْأَوْسِيِّ يَسْمُو
إِلَى الْخَيْرِ مَنْقَطَعَ الْقَرِينِ
إِذَا مَا رَايَةَ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ
تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ.

‘আমি সাক্ষী—আরাবা দান করতে করতে আকাশ-উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন, আর তার সঙ্গীরা পড়ে আছে মাটির পৃথিবীতে। যখনই মর্যাদার কোনো পতাকা সম্মুখ হয়, দেখবে—তা ধরে আছেন আর কেউ নয়—শুধু আরাবা!’

আরেকজন বললো :

—‘না বন্ধুরা, আমি তোমাদের সাথে একমত হতে পারছি না। আমার মতে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদা। আমার মতে তিনিই সেরা দানবীর।’

তিনজনের তিন মত। কেউ কারও মত মানতে রাজি নয়। সবাই নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করছে। শান্ত বিতর্কটা রূপ নিয়েছে অশান্ত তর্কে। এবার উপস্থাপক (গৃহকর্তা) মুখ খুললেন। বললেন :

—‘শোনো বন্ধুরা, আমি বিষয়টির অবতারণা করেছি এমন অশান্ত তর্ক বাঁধাবার জন্যে নয়। আমি চাই সত্যটা বেরিয়ে আসুক।’

একটু চুপ থেকে তিনি বললেন :

দান শেখার পাঠশালা

-আলী তানভাভী

গত রাতের পরিবেশটা ছিলো চমৎকার। প্রচণ্ড শীতেও কামরাটা ছিলো নাতিশীতোষ্ণ (নয় অতি শীত, নয় অতি গরম অবস্থা)। ভাবছিলাম—কী নিয়ে লেখা যায়।

আমার টেবিল-ল্যাম্পটা আলো ছড়াচ্ছে। নিকটেই টেলিফোন। ছেলেমেয়েরা যে যার পড়াশোনায় ব্যস্ত। একটু আগে সবাই রাতের খাবার শেষ করেছে। মোট কথা, সবকিছুই শান্ত ও অনুকূল। সুন্দর কোনো লেখা জন্ম নেয়ার মতো সত্যি উপযোগী একটা পরিবেশ। কারও বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। নেই কারও কাছে কোনো চাহিদাও। আমি খুব তৃপ্তি অনুভব করলাম। হৃদয়োৎসারিত কণ্ঠে বললাম—
আলহামদু লিল্লাহ!

‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলার সাথে সাথে মাথায় একরাশ চিন্তা এলো। এই-যে আমরা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলে শোকর আদায় করি এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান গাই, এ কিন্তু শুধুই উচ্চারণ-সর্বস্ব নয়। হোক সে-উচ্চারণ হাজার মুখে লক্ষ বার। বরং এই ‘আলহামদু লিল্লাহ’ হলো অনেক ব্যাপক ও বহুমাত্রিক।

আরেকটু খুলে বলি—আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত লাভের পর ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলার অর্থ হলো—এই নেয়ামত থেকে আমি নিজেই শুধু উপকৃত হবো না, বরং মুখাপেক্ষী ও অভাবীর জন্যেও এখানে থাকবে অংশ। সুতরাং ধনীর প্রশংসার অর্থ হলো—দরিদ্রকে দান করা। সবলের প্রশংসার অর্থ হলো—দুর্বলকে সহযোগিতা করা। সুস্থ ব্যক্তির প্রশংসার অর্থ হলো—অসুস্থ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। শাসকের প্রশংসা মানে—শাসিতের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

আমার আলহামদু লিল্লাহ বলা তাৎপর্যহীন; যদি আমার প্রতিবেশী কষ্টে থাকেন। আমার প্রতিবেশী আমার কাছে হাত নাও বাড়াতে পারেন। তার লাজবিনম্র স্বভাব তাকে বাধাও দিতে পারে। কিন্তু আমার দায়িত্ব কী? আমার দায়িত্ব হলো—যেচে (নিজের ইচ্ছায়) তাকে জিজ্ঞাসা করা এবং তার পাশে দাঁড়ানো।

এ সব যখন আমি ভাবছিলাম তখনই আমার স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়ালেন। আমার নিবিষ্টতা-আচ্ছন্ন নীরবতা ভেঙে জানতে চাইলেন :

—‘তন্ময়চিন্তে কী এতো ভাবছেন?’

আমিও বীর হতে চাই

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

চাচাজান হামজার বীরত্ব

এক.

‘সাফা’—কাবার একটি প্রিয় প্রবেশদ্বার। কাবার দক্ষিণ দিকে গেলেই সাফা পাহাড়ের সাথে লাগোয়া এই প্রবেশদ্বারটা চোখে পড়ে। একদিন এই প্রবেশদ্বারের কাছে আবু জেহেল আল্লাহর নবীকে পেয়ে আজেবাজে আচরণ করলো। অনেক কটু কথা বললো। নবীজি অনেক ব্যথা পেলেন। কোনো জবাব দিলেন না। সহ্য করলেন।

কিন্তু আবু জেহেল এখানেই থামলো না; আরও সামনে বাড়লো। গালি থেকে প্রহার। একটা পাথর তুলে নিয়ে নবীজিকে ছুড়ে মারলো। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে (গলগলিয়ে, প্রবল ধারায়) রক্ত বেরুতে লাগলো। ব্যথিত রক্তাক্ত নবী তবুও কিছু বললেন না, নীরবে গৃহে ফিরে গেলেন। অদূরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাদআনের এক দাসী সব দেখলো, সব শুনলো। তার মনের গভীর দাগ কাটলো এই ঘটনা। সে কোনোভাবেই হজম করতে পারছিলো না। কার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলে তার মনের আগুন একটু নিভবে, সে তাই ভাবছিলো আর অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলো।

দুই.

মহাবীর হামজা মক্কার বাইরে গিয়েছিলেন শিকারে। এ-ঘটনার খানিকটা পরই তিনি শিকার থেকে ফিরে এলেন। বাড়ি ফেরার পথে দেখা হয়ে গেলো ওই বাঁদির সাথে। সে হামজাকে দেখেই ছুটে এসে সবকিছু এমন করে বলে দিলো, যেনো নিজেই আক্রান্ত হয়েছে। চাচাজান হামজাও এমন করে সব শুনলেন যেনো তিনি নিজেই আহত হয়েছেন।



আবু জেহেলের বধ-কাহিনি

আবার শিশু । আবার বীরত্ব । এবার আরও তীব্র । আরও বিস্ময়কর ।

বদর যুদ্ধের কাহিনি । বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ডানে বামে তাকালেন । দেখলেন—তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই বালক । মুআয ইবনে আমর ইবনে আল জামুহ এবং মুআওয়ায ইবনে আফরা । তিনি আশা করছিলেন—তার পাশে বড়ো কেউ থাকবেন এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করবেন । কিন্তু এদের দেখে তিনি তেমন খুশি হতে পারলেন না । তবে তার অখুশি ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না । একটু পরই তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন যে, দু-বালকের এক বালক চাপা উত্তেজনায় তার কাছে এসে আবু জেহেলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে । অপরজনও তাকে এসে একই কথা জিজ্ঞাসা করলো । যুদ্ধের ময়দানে এভাবে শত্রুপক্ষের পরিচয় জানতে চাওয়ার একটাই অর্থ—আমি তাকে শেষ করে দেবো! কিন্তু তিনি হোঁচট খেলেন । কেননা, এরা বেশ ছোটো । অনেকটা হতাশ কণ্ঠেই বললেন :

—‘তার পরিচয় জেনে কী করবে!’

তাদের পক্ষ থেকে জবাব ভেসে এলো পরিষ্কার ভাষায়, নির্দিষ্ট কণ্ঠে :

—‘আবু জেহেল আমাদের নবীজিকে গালিগালাজ করেছে । আমরা এর কঠিন বদলা নেবো । আমরা তাকে জাহান্নামে পাঠাতে চাই ।’

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ খুশি হয়ে তাদেরকে কথা দিলেন । বললেন :



—‘অবশ্যই আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো—কে এই আবু জেহেল। একটু অপেক্ষা করো!’

যুদ্ধ শুরু হলো। আবু জেহেল মুশরিকদের সেনাপতি। নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলো। মুশরিক-বাহিনীর কাতারে কাতারে ব্যস্ত ছুটোছুটি করছিলো। এক সুযোগে তিনি বালকদ্বয়কে ডেকে আবু জেহেলকে চিনিয়ে দিলেন। বালকদ্বয় তখন আর বালক থাকলো না—বীর সৈনিকে পরিণত হলো। তাদের কচি-তাজা রক্তে যেনো আগুন জ্বলে উঠলো।

শিকার লক্ষ করে তারা তীব্র বেগে ছুটে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যেও তারা ভাবলো না—আবু জেহেল একজন ‘বড়ো’ মাপের যোদ্ধা। সেনানায়ক। আর তারা ছোটো। একেবারেই ছোটো। এ-সব তারা কিছুই ভাবে নি। তারা শুধু ভাবছিলো—আবু জেহেল আমাদের নবীজিকে গালি দিয়েছে। আবু জেহেল নবীজির দুশমন। ইসলামের দুশমন। এই আবু জেহেলের কোনো ক্ষমা নেই। মুহূর্তেই তারা আবু জেহেলের কাছে পৌঁছে গেলো। দক্ষ রণ-কুশলীর মতো তরবারি হাতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সেদিন বদর প্রান্তরে এই দুই কিশোরের বীরত্বের কাছে আবু জেহেল অধ্যায়ের শোচনীয় ভরাডুবি দেখে আসমানের ফেরেশতারা কি হত্যা করে বলেছিলো—‘ওই দেখো, দু-খুদে সৈন্যের হাতে শত্রু-সম্রাটের কী করুণ পরিণতি!’

বুঝতেই পারছো, খুব বেশি সময় লাগলো না, আবু জেহেলের মৃত্যু নিশ্চিত করে তারা ফিরে এলো—প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। অভিযান সাফল্যের আনন্দ বুকে নিয়ে। মুখে নবী-প্রেমের তাজা তাজা গোলাপ ফুটিয়ে।

এতোদিন প্রতিশোধের আগুনটা বুকে জ্বলছিলো। আজ জ্বলছে বাইরে। বদর প্রান্তরে। প্রতিশোধের সে-আগুনে ভস্ম হয়েছে শয়তানের চির-মিত্র—আবু জেহেল।



নবীজির বীরত্ব দেখো

তখন রাত । চারদিকে সুনসান নীরবতা । হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে মদীনাবাসী আঁতকে উঠলেন । তারা ভাবলেন—

হয়তো দুশমন এসেছে মদীনা আক্রমণ করতে । সবাই তাৎক্ষণিকভাবেই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে আওয়াজের উৎসটা লক্ষ করে এগিয়ে যেতে লাগলেন ।

পথেই সবার দেখা হয়ে গেলো নবীজির সাথে । নবীজি তখন সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন :

—‘ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটে নি! আর (আবু তালহার) ঘোড়াটা দেখছি খুব দ্রুতগামী!’

প্রশ্ন জাগে মনে, নবীজির সাথে পথে দেখা হলো কীভাবে? আসলে নবীজি নিজেও এ-আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন । কোনো কিছুর অপেক্ষা না-করে তাৎক্ষণিকভাবেই তিনি যুদ্ধের পোশাক পরে আওয়াজের উৎসটা লক্ষ করে সবার আগে হযরত আবু তালহার একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন ।

গিয়ে দেখেন, আশঙ্কাটা অমূলক । ভয় পাওয়ার মতো কিছুই ঘটে নি । পরে তিনি ফিরে আসেন । পথেই দেখা হয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে ।

আল্লাহ্ আকবার!



বীরত্বের ঝলক

ওহুদ যুদ্ধ চলছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তরবারি নিয়ে ঘোষণা করলেন :

—‘কে নেবে এই তরবারি?’

সাহাবীরা এগিয়ে এলেন। কে-না চান—রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিতে? তাঁর তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে? সবাই নিতে চান তরবারিটি। এখন কাকে দেবেন নবীজি? নেয়ার মানুষ অনেক। তিনি আবার ঘোষণা করলেন :

—‘কে নেবে এই তরবারি? কে পারবে এর হক আদায় করতে?’

বিশিষ্ট সাহাবী আবু দুজানা এগিয়ে এসে বললেন :

—‘হে আল্লাহর রাসূল, এর হক কী—কীভাবে আদায় করবো?’

আল্লাহর নবী ইরশাদ করলেন :

—‘এর হক হলো—তা দিয়ে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না এবং কাফেরের ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে না।’

আবু দুজানা নবীজির কাছ থেকে তরবারিটি নিলেন। তারপর মাথাটা একটা লাল মস্তকবন্ধনী দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন।

তারপর?

তারপর এগিয়ে গেলেন অকুতোভয় বীরের মতো, শত্রু শিবিরের কাতারের একেবারে গভীরে। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা আলো ছড়াচ্ছে তার চোখে-মুখে। হঠাৎ তার চোখ পড়লো—এক মুখোশধারী অশ্বারোহী সৈন্যের ওপর। সে কাফের-সৈন্যদেরকে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করছিলো। আবু দুজানা ঠিক করলেন—একে দিয়েই আক্রমণ শুরু করবেন। তাহলে অন্যদের মনোবলে চিড় ধরানো যাবে। আবু দুজানা এগিয়ে যাচ্ছেন। তরবারি খাপমুক্ত করলেন। এন্ফুনি আঘাত করবেন।

কিন্তু হঠাৎ তার কানে এসে বাড়ি খেলো অশ্বারোহীর কণ্ঠ। এ-যে মহিলা-কণ্ঠ! সাথে সাথে তিনি তরবারি নিচে নামিয়ে ফেললেন। আল্লাহর রাসূল দিয়েছেন এ-তলোয়ার। এটি কোনো মহিলার খুনে রঞ্জিত হলে এ-তলোয়ারের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। এর হক নষ্ট হয়ে যাবে।

বন্ধু,

বীরত্ব কাকে বলে—দেখলে? যুদ্ধে নারী-হত্যা ইসলাম সমর্থন করে না। শিশু ও বৃদ্ধ হত্যাও ইসলাম সমর্থন করে না। নারী যতো বড়ো দুশমনই হোক, তার রক্তে কক্থনও কোনো মুসলমানের হাত লাল হয় না। হতে পারে না।

কিন্তু হে ইসলামের দুশমনেরা,

হে ইহুদিরা,

হিসাব রাখো কি—কতো ফিলিস্তিনী শিশু ও নারীর রক্ত লেগে আছে তোমাদের হাতে?

হে খৃষ্টানেরা,

আফগানিস্তানে ইরাকে সিরিয়ায় কী করেছে তোমরা?

অসংখ্য নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে। নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে তোমরা অপরাধ করেছে।

হযরত আবু দুজানার কাছ থেকে নেবে কি কোনো শিক্ষা?

ইসলামের উদার যুদ্ধনীতি মানতে কোথায় তোমাদের বাধা?

কেনো তোমরা সুযোগ পেলেই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে লিপ্ত হও?

তোমরা কবে ছাড়বে এ-সব যুদ্ধাপরাধ?



‘বল বীর, চির উন্নত মম শির’

এক.

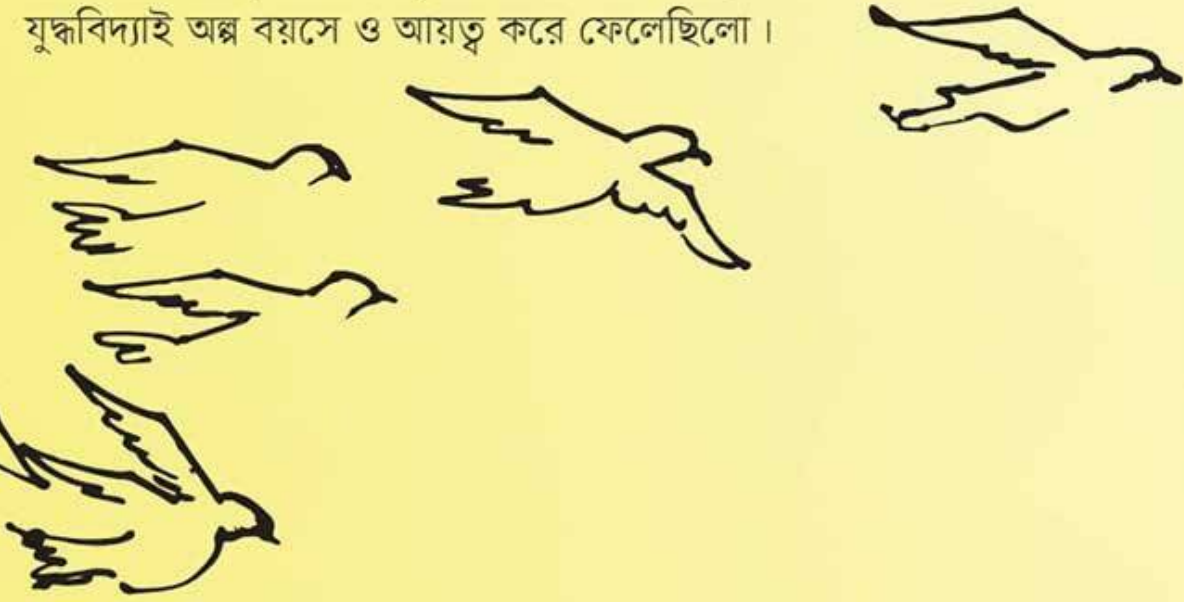
তিকরিত। ইরাকে আজমের একটি ছোটো কিন্তু গর্বিত নগরী। তিকরিত জন্ম দিয়েছে অনেক বিস্ময়কর প্রতিভা। অনেক প্রথিতযশা শাসক। দুনিয়া-কাঁপানো অনেক সেনাপতি। তিকরিত এক রত্নগর্ভা সারজমিন। তিকরিতের এক বিস্ময়-বালক নিয়েই এই ‘ছোটো গল্প’।

ইউসুফ। ওর রূপে যেমন ইউসুফি-সৌন্দর্যের বালক—স্নিগ্ধ কোমল আভা ছড়িয়ে দিয়েছিলো, তেমনই ওর চরিত্রও ছিলো ইউসুফি মাধুরীতে অপরূপ রূপময়। ওর বয়সী অন্য হাজারটা ছেলের সাথে ওর কোনো মিল নেই। ও অনেক আলাদা। অনেক বিভ্রময়। ওর চাল-চলন, মন-মনন ও চিন্তা-চেতনা—সব ভিন্ন।

সত্য ও সুন্দরের প্রতি ছিলো ওর অদ্ভুত আকর্ষণ। পাশাপাশি অসত্য ও অসুন্দরের প্রতি ছিলো প্রচণ্ড ঘৃণা। বাবা খুব আদর করতেন ইউসুফকে। প্রতিদিনই তিনি ওর সামনে মেলে ধরতেন—উত্তম আদর্শের নমুনা। শোনাতেন ওকে—পূর্ব পুরুষের কীর্তিময় কাহিনি।



ছেলের পড়ালেখার প্রতিও বাবার ছিলো বিশেষ নজর। ছিলো সচেতন দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধায়ন। তাই বয়স দশ পেরুতে-না-পেরুতেই ইউসুফ হাফেজে কুরআন হয়ে গেলো। ছোটো বড়ো অনেক হাদীসও মুখস্থ করে ফেললো। পাশাপাশি জিহাদের প্রতিও ছিলো ওর খুব ঝাঁক ও আকর্ষণ। বাবার ইচ্ছে ও নিজের আগ্রহে যুদ্ধবিদ্যা ও রণকৌশল আয়ত্ত্ব করতেও চলছিলো সুদক্ষ সেনা-প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিবিড় প্রশিক্ষণ। তরবারি-চালনা, তিরন্দাজি, নিশানাবাজি ও ঘোড়সওয়ারি—এ ধরনের আরও অনেক যুদ্ধবিদ্যাই অল্প বয়সে ও আয়ত্ত্ব করে ফেলেছিলো।



দুই.

ইউসুফের আরেকটা মজার শখের কথা বলি। ওর ছিলো কবুতর পোষার মজার শখ। নানা বর্ণের নানা প্রজাতির কবুতর কিনে এনে সেগুলোকে যত্ন করে পালতো, বড়ো করতো এবং বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তুলতো। এভাবে কবুতরের সঙ্গে ইউসুফের একটা বন্ধু-বন্ধু ভাব গড়ে উঠেছিলো। রোজ রোজ এগুলোর পেছনে ও সময় দেয়। ওদের খুব যত্ন করে, দেখভাল করে। এভাবে শৈশবটা খুব মজা করেই কাটাচ্ছিলো ছোটো ইউসুফ এই তিকরিতে।

কিন্তু সময় তো আর এক প্রবাহে বয়ে যায় না। জীবন-প্রবাহের রয়েছে কতো বাঁক! ইউসুফের জীবনেও কি এখন আসবে কোনো বাঁক? একদিন বাবা ইউসুফকে একান্তে ডেকে বললেন :

—‘ইউসুফ, তোমাকে তিকরিত ছেড়ে হাল্ব (সিরিয়ার ঐতিহাসিক একটি শহর) যেতে হবে। অসমাপ্ত পড়ালেখা সমাপ্ত করতে হবে। সুতরাং তিকরিত নয়—হাল্বই

এই আমাদের ফিলিস্তিন

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

ইতিহাসের কাছেই ফিরে গেলাম

এসো আমার দূর অতীত

আমি ফিরে যেতে চাই আমার গরবের ইতিহাসে। বর্তমানের নিষ্ঠুরতা বারবার আমার গলা চেপে ধরছে। আমি কি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো না? দম বন্ধ পরিস্থিতি সওয়া যায়, কিন্তু কাঁহাতক? একটা সীমা থাকা উচিত। আর দেরি নয়, বিদায় তোমাকে হে নিষ্ঠুর বর্তমান, স্বাগত তোমায় হে হারিয়ে-যাওয়া ইতিহাস—হে গরবের অতীত!

ইতিহাসের কোলে ফিরে গেলে কী এমন ক্ষতি হবে এই নিষ্ঠুর অবিবেচক বর্তমানের? কিন্তু আমার অনেক উপকার হবে। অনেক আনন্দ হবে। অনেক মজা হবে। অনেক ঘুম হবে। খুব দরকার একটু শান্তির .. একটু স্বস্তির। দারিদ্র্যপিষ্ট পৃথিবীর মাঝে শতো হাজার বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ধ্বংস করে অ্যাটম বোমা বানিয়ে যারা উন্মাদ উল্লাসে মানুষ মারে .. হিরোশিমা-নাগাসাকি ধ্বংস করে দেয় গুচ্ছ বোমায় এবং আরও নাম না-জানা বিধ্বংসী মারণাস্ত্রে থামিয়ে দেয়—আফগানিস্তান ইরাক লিবিয়া সিরিয়া ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের লাখ লাখ শিশুর কলোকলো কোলাহল, তাদের কবল থেকে অন্তত মুক্তি মিলবে।

ঘোড়সওয়ারি তিরন্দাযি—সেও হবে! নেযাবাযি? ইচ্ছেমতো! তলোয়ার চালনা? নিঃসন্দেহে! সবই থাকবে। সবই পাবো। বর্তমানের নিষ্ঠুরতা ছাড়া স-ব আছে ওখানে। তাহলে চলেই যাই একটু! আমার কথায় তুমি কি হাসির খোরাক দেখতে পাচ্ছে? হায়! আমি এই নিষ্ঠুরতার বেষ্টনীতে কী কষ্টে আছি, তা যদি তোমাকে কোনো যন্ত্রের সাহায্যে দেখাতে পারতাম!

এখন আমি মদীনায়

এখন আমি মদীনায়। খোলাফায়ে রাশেদার যুগের মদীনায়। আবু বকর এখন খলীফাতুল মুসলিমীন। কিন্তু তার মাথায় এ-বোঝাটা কেনো? শুনবে?

তিনি বাজারে যাচ্ছেন। ব্যবসা করবেন। জীবিকার সন্ধানে একটু সময় দেবেন। পথেই দেখা হয়ে গেলো হযরত উমরের সাথে। এ কি! আপনি বোঝা নিয়ে ...? ব্যবসা? না, এ কিছুতেই হয় না। আপনি তো এখন খলীফাতুল মুসলিমীন। ফিরে চলুন! বাইতুল মাল থেকে আপনার ভাতার ব্যবস্থা করবো আমরা।

কিন্তু সেই উমর আর এই উমরে কী পার্থক্য! নবীজির পরশে .. আবু বকরের ছায়ায় আর খেলাফতের গুরুভারে এই উমর এখন অন্য উমর । দারুণ প্রজা-হিতৈষী ।

প্রিয় বন্ধু আবদুর রহমান ইবনে আউফকে নিয়ে রাতের আঁধারে কেনো ঘুরে বেড়ান তিনি মদীনার পথে পথে—অভাবী মুখাপেক্ষী ক্ষুধার্ত মানুষের খোঁজে? অমন প্রজা-হিতৈষী নৈশভ্রমণের নজির কোন্ যুগের কোন্ রাজার আছে? খুব সাধারণ জীবন হযরত উমরের । একটুও বদলান নি তিনি । খলীফা হওয়ার আগে যেমন ছিলেন, পরেও তেমনই রয়ে গেছেন । বরং খলীফা হওয়ার পর আম জনতার সাথে আরও বেশি করে মিশতে শুরু করেছেন তিনি । তিনি যেনো তাদেরই একজন । তাকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল যে, তিনি খলীফা ।

খেজুরপাতা তার বিছানা । বাইরে চলাফেরার সময় চলেন একাকী—কোনো পাহারা ছাড়াই । চলতে চলতে ক্লান্তি এলে বসে পড়েন—খেজুরের ছায়ায় .. শুয়ে পড়েন মরুবালির বিছানায় । চোখটা একটু বুজে বুজে এলে—ওখানেই ওই বালির উপরেই শুয়ে থাকেন এমন নিশ্চিন্তে, যেনো

তিনি শুয়ে আছেন নিজের ছায়ানীড়ে ।

আল্লাহ্ আকবার!



দজলার আনন্দ-আবহকে বিদায়। এখন মন চলে গেছে দুঃখ-প্রবাহ—ফুরাতের কাছে।
বিদায় দজলা। ইয়া দিজলাতাল খায়র—হে কল্যাণ টাইগ্রিস!

এই যে, এখানেই বয়ে চলেছে ফুরাত। ফুরাতের তীর এখন সুজলা সজীব। এখানে
ওখানে সৃষ্টি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ঝোপঝাড়। হঠাৎ করে তাকালে মনে হয়—একগুচ্ছ সবুজ
যেনো পানিতে ভাসছে। বাংলাদেশে বসে ‘ফুরাত’ কানে এলেই চোখের সামনে ভেসে
উঠতো ধু ধু বালিয়াড়ি। এখন দেখছি আমার কল্পনার ফুরাতের চেয়ে এ-ফুরাত অনেক
ভিন্ন। দজলা ফুরাতের মাঝে পার্থক্য আছে?

শুধু বুঝি—দজলার দিকে তাকালে মন-মানস কোমল হয়। কমনীয়তায় ভরে
ওঠে। মিষ্টি একটা আচ্ছন্নময়তা ছেয়ে যায় হৃদয় জুড়ে। আর ফুরাতের পানির দিকে
তাকালে মনটা দুঃখে বেদনায় জ্বলে জ্বলে ওঠে। আহা, পানির কী বিশাল প্রবাহ!
কিন্তু ক-ফোঁটা পানির জন্যে কাতরাতে কাতরাতে এখানে হোসাইনজাদা শিশু আলী
আকবরকে জীবন দিতে হয়েছিলো, ইয়াজিদ-বাহিনীর নিষ্ফিষ্ট তিরে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম
পরিবারটির জন্যে ফুরাতের পানি ‘নিষিদ্ধ’ করে দিয়েছিলো ইবনে মারজানা। অভিশপ্ত
কোথাকার! ফুরাতের পানি কুকুর-বেড়াল-শৃগাল পর্যন্ত পান করতে পারছিলো, অথচ
ভূ-পৃষ্ঠে বেঁচে-থাকা একমাত্র নবী-দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের জন্যে মানা!



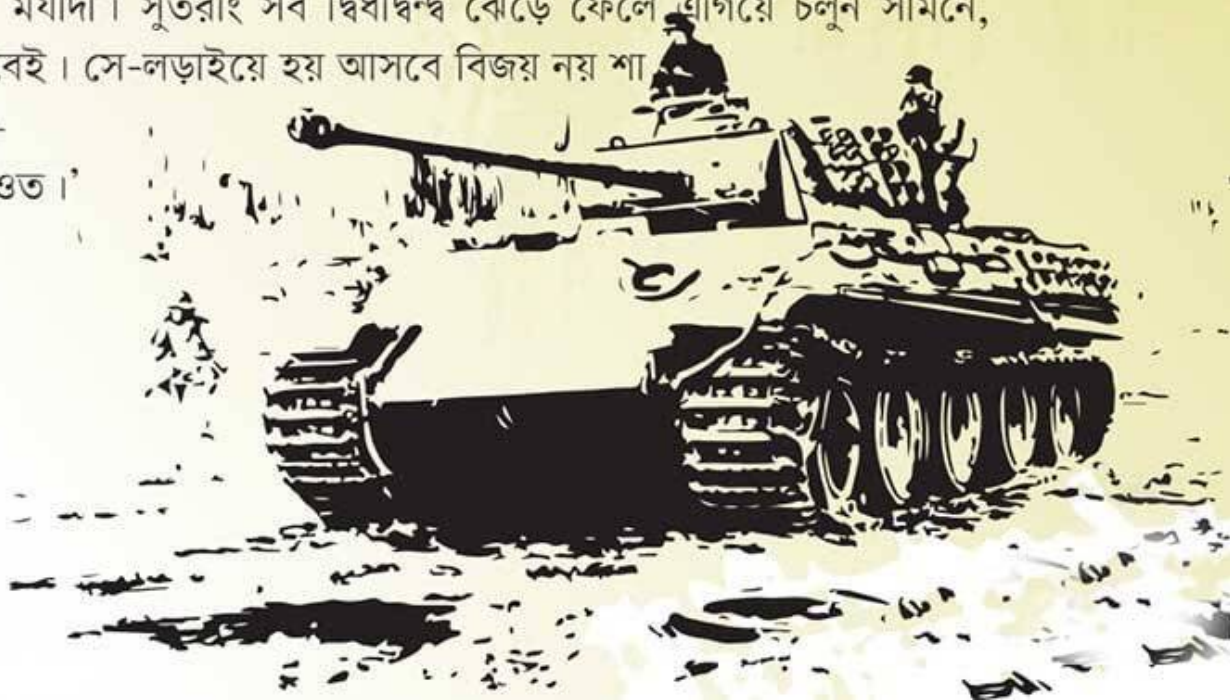
জীবন । ওষুধহীন .. পথ্যহীন অবরুদ্ধ । ফিলিস্তিনের তরুণ যুবা মানেই—অবিনাশী চেতনায় ছাওয়া দ্রোহ মেশানো একগুচ্ছ শাগিত শব্দমালা, যা কাগজে ঐকে দিলে ভাষাটা দাঁড়ায়—‘এসো অস্ত্র ধরি । লড়াই করি । ফিলিস্তিনকে মুক্ত করি । আলআকসা ফিরিয়ে আনি । বজ্জাত ইহুদিদের বিতাড়িত করি । আমাদের ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, না-আসুক । যদি আমাদের পাশে এসে কেউ না-দাঁড়ায়, না-দাঁড়ালো । আমরা সামনে চলবোই । রক্ত-নদী পেরিয়ে । শহিদের রাঙা মিছিল সঙ্গে নিয়ে । বাইরের মুসলিম বিশ্ব এবং ভেতরের মানুষ যতোই করুক বেঈমানি গাদ্দারি, ইহুদিদের সাথে গলাগলি, আমরা দমবো না । থামবো না । হীনবল হবো না । আমাদের জিহাদ চলবেই । অব্যাহত থাকবেই । আমরা । আমাদের মধ্যে শেষ ফিলিস্তিনীটি জীবিত থাকা পর্যন্ত । সৈন্যসংখ্যা আর অস্ত্রবলে আমরা লড়াই করি না, কখনও করিও নি । আমরা লড়াই করি শুধুই ঈমানের বলে—ইখলাসের বলে । আমরা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারী । যিনি দুই লাখ রোমক সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে লড়াই করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, শঙ্কিত হন নি । বরং সহযোদ্ধাদের মধ্যে যারা রোমক-বাহিনীর সংখ্যা-ভীতিতে আক্রান্ত হতে যাচ্ছিলেন, তাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বীরোচিত ঘোষণায়—

والله! ما نقاتل بعدد ولا عدة! إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا إما ظفر

وإما شهادة!

‘আল্লাহর কসম! সৈন্যবল আর অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে আমরা লড়াই করি না । আমরা লড়াই করি সেই দ্বীনের বলে বলীয়ান হয়ে, যে দ্বীন আমাদের দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদা । সুতরাং সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলুন সামনে, লড়াই হবেই । সে-লড়াইয়ে হয় আসবে বিজয় নয় শাহাদাত—

শহিদী মওত ।’



ফিলিস্তিনীরা মাহমুদ শাইত খাত্তাবকে কখনও ভোলে নি। ভুলে যায় নি কেউ তার রেখে-যাওয়া অবদানের কথা ও বার্তা। কৃতজ্ঞচিত্তে আজও সবাই তাকে স্মরণ করে। তার দেখিয়ে-যাওয়া পথে অবিচল থাকার শপথে বলীয়ান। কান পাতলেই শোনা যাবে তাদের সেই প্রত্যয়দীপ্ত পঙ্ক্তিমাল্য—আমরা গর্ব করি—আমাদের ইরাকী ভাই ‘জেনিনের বীর’ সিপাহসালার মাহমুদ শাইত খাত্তাবকে নিয়ে। তার দেখানো পথে চলেই আমরা অর্জন করবো বিজয়। ছিনিয়ে আনবো স্বাধীনতা—গড়ে তুলবো ইহুদিমুক্ত ফিলিস্তিন। আমরা কখনও তাকে ভুলবো না।

বিশেষ করে জেনিন ছাড়ার আগে এক অশ্রুসজল বিদায়ী অনুষ্ঠানে আমাদের চোখে চোখ রেখে যে-কবিতা তিনি আবৃত্তি করে গেছেন, তা আমাদের বাঁকে বাঁকে দিকনির্দেশনা দেবে। তিনি সেদিন এক দীর্ঘ কবিতার শেষে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে গিয়েছিলেন—

إن الخلود لمن يموت مجاهداً + ليس الخلود لمن يعيش جباناً.

‘জিহাদ করতে করতে যে মরে, তার জন্যেই লেখা হয় অমর অক্ষয় জীবনের মহিমা, আর যে-কাপুরুষ, তার জীবন আবার জীবন নাকি? কিসের আবার চিরন্তনতা?’

তিনি আমাদের আরও বলেছেন—‘ইহুদিরা জাত কাপুরুষ। সত্যিকারের জিহাদকে ওরা যমের মতো ভয় পায়। এরা কখনও দীর্ঘ মেয়াদি যুদ্ধে টিকে থাকতে পারে না। সে-মনোবল কোনোকালেই ওদের ছিলো না। ৬৭’র আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরবেরা ইহুদি-বাহিনীর কাছে হেরে গিয়েছিলো। কারণ, আরবেরা নিজেদের উজাড় করে দিয়ে লড়তে পারে নি—গাদ্দার ঢুকে পড়েছিলো ভেতরে। অনেক দেশই ছিলো জয়-পরাজয় নিয়ে দ্বিধান্বিত, ভাবিত।

আরবেরা সন্মিলিতভাবে ওদেরকে রুখে দাঁড়ালে গাজা-সমুদ্রে সেদিনই ইসরাঈলের সলিল সমাধি রচিত হতো। ঝড়ের কবলে-পড়া পর্ণকুটিরের মতো ওরা চিহ্নহীন হয়ে যেতো। ফিলিস্তিনের আকাশে শকুনের ওড়াউড়ি বন্ধ হয়ে যেতো।’

তিনি আরও বলেছেন—

‘ইসরাইল স্বপ্ন দেখে—ফুরাত থেকে নীল পর্যন্ত নিজেদের নষ্ট সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করতে। এ জন্যে ওরা—ইরাক গিলবে, সিরিয়া গিলবে, মিসর গিলবে, লেবানন গিলবে এবং তুরস্কের দিকেও মুখ হা করে এগিয়ে যাবে। ফিলিস্তিনকে তো পেটের ভেতরে নেবেই। আর জেরুসালেম তো ওদের বিশেষ লক্ষ্য। ওদের এক নেতা বলেছে—

‘জেরুসালেম ছাড়া ইসরাইল হতে পারে না এবং হায়কাল-এ-সোলায়মানী ছাড়া জেরুসালেম হতে পারে না ।’

(আর এ-হায়কাল স্থাপন করতে গেলে মসজিদুল আকসা অক্ষত থাকবে না । ওরা তা ভেঙে ফেলবেই ।) এ-স্বপ্ন বাস্তবায়নে ওরা সব সময় কাজ করে যাচ্ছে । নীল নকশা তৈরি করছে । আমরা অনেকেই এ ব্যাপারে বে-খবর, উদাসীন ।’

আমরা সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চাই—

আমরা ফিলিস্তিনের তরুণ-যুবা-দামাল ছেলেরা—আমাদের পূর্বসূরিদের পথ থেকে এক পাও পেছনে সরে আসবো না । আমাদের জিহাদ চলবে । আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে । দেশের জন্যে লড়াই করলে, আলআকসার জন্যে লড়াই করলে, আমাদের মা-বোনের সম্রমের জন্যে লড়াই করলে, সর্বোপরি পবিত্র ভূখণ্ড ফিলিস্তিনকে ইহুদিমুক্ত করার জন্যে লড়াই করলে কেউ যদি আমাদের সন্দ্বাসী বলে, বলুক! এমন সন্দ্বাস মিশে যাক আমাদের রক্তে-মাংসে, অস্থি মজ্জায় । চেতনার পরতে পরতে । এমন সন্দ্বাস ও সন্দ্বাসীকে আমরা স্বাগত জানাই এখানে—এই ফিলিস্তিনে, সতত বিমুক্ততায় । লাল নীল দীপাবলীর মায়াবী আলোকসজ্জার আবিরে ।



ত্বীন যাইতুনে ছাওয়া ফিলিস্তিন : বরকত ঘেরা এক পুণ্যভূমি

ধন্য তুমি পুণ্যভূমি

ফিলিস্তিন—কী সুন্দর নাম! বারবার উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয়। একেক উচ্চারণে যেনো একেক মহিমা। এই দেখো, আমি উচ্চারণ করছি—‘ফিলিস্তিন’! আহা, কানে যেনো মধু ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভবে বইয়ে দেয়—মধু-মধু স্বপ্ন। কল্পনায় ঐকে দেয়—বীর হওয়ার জ্বলজ্বলে সংকল্প। তুমিও কি উচ্চারণ করবে আমার সাথে? করেই দেখো-না একটু! আমার বিশ্বাস—তোমার মনেও আলআকসায় নামাজ পড়ার ইচ্ছেটা হুড়মুড় করে জেগে উঠবে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করবে অবিলম্বে আলআকসার দেশ—ফিলিস্তিনে।

কেনো ফিলিস্তিনের প্রতি এই ভালোবাসা ও হৃদয় টান? কারণ আছে। ওখানে জেরুসালেম আছে, তার বুকে আলমাসজিদুল আকসা আছে। আছে কুন্সাতুস সাখরা। ওখানে গাজা আছে, তার বুকে জিহাদী চেতনা আছে। শহীদ হওয়ার ব্যাকুলতায় বারবার চোখ ভিজে উঠার দৃশ্য আছে। ওখানে আলখলীল শহর আছে। সেই শহরে ইবরাহিম ইয়াকুব ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের মাজার আছে। ওখানে দাউদ ও সোলায়মান আলাইহিমাস সালামের মহা-সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক কীর্তিগাথা আছে। আছে আরও কতো কী! ক-টা বলবো? চলো আরও সামনে যাই!

একটু ঘুরে ঘুরে দেখি—প্রিয় ফিলিস্তিনকে

হে আল্লাহ, মুক্ত করো আলআকসা .. আস সাখরাহ

কতো দেখেছি আমরা মসজিদুল আকসা আর কুন্সাতুস সাখরার ছবি। দেখলেই মনে হয়—বরকতের ফল্গুধারা যেনো ঝরে ঝরে পড়ছে। যাইতুন আর ত্বীনে ত্বীনে যেনো সে-বরকত ঝলমল করছে। সবুজ পাতাগুলো কি এ জন্যেই এতো সবুজাভ দেখায়? কুন্সাতুস সাখরার দৃশ্য দেখলে কেবলই ইচ্ছে করে—হাত দিয়ে তা ছুঁয়ে দেখতে।

এতো সুন্দর কারুকাজে কে গড়েছে সাখরা তোমাকে? সাখরা যেনো ফিসফিস করে জবাব দেয়—জানো না বুঝি! উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান।

আর আমার কারুকাজ দেখাশুনা করেছেন দু-জন বড়ো বড়ো প্রকৌশলী । একজন হলেন বিশিষ্ট তাবেঈ, খলীফা সোলায়মান ইবনে আবুল মালেকের বিশিষ্ট মন্ত্রী—রাজা ইবনে হায়াত আলকিনদী আর অপরজন হলেন খলীফার স্নেহভাজন আজাদ গেলাম ইয়াজিদ ইবনে সালাম । এরা দু-জনই নকশা ঐঁকেছেন ।

সারা পৃথিবীতে কতো গম্বুজ আছে, সে-সব গম্বুজের কতো কারুশিল্প ও চারুকলা চোখে পড়ে । কিন্তু দিব্যি করে বলো তো, সবুজ গম্বুজের পর সাখরার গম্বুজের মতো অমন দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ এবং তার উপর অমন সোনালি ছাউনি—কে কোথায় কখন দেখেছে? ভেতরে ঠিক মাঝখানের গোলাকার জায়গাটিতে বোরাক-স্মৃতি-বিজড়িত সাখরা বা পাথর খণ্ডটিতে চোখ পড়লে ব্যাকুল মন বলে ওঠে—ফিলিস্তিনের হে মহা-দূরত্ব, গুটিয়ে যাও! দেখতে চাই চোখভরে এই পাথরখণ্ড! জীবনে কি আসবে না এক নজর এটি দেখে চোখ শীতল করার মহা-লগ্ন? হে শাম, হে ফিলিস্তিন, কেনো তোমরা আমাদের বিরহ-কষ্ট বোঝো না?

يا طوبى للشام يا طوبى للشام، قالوا يا رسول وبم ذلك؟ قال : تلك ملائكة الله
باسطوا أجنحتها على الشام. [الراوي : زيد بن ثابت. المصدر : صحيح الترمذي]

‘হে শাম, তুমি ধন্য! হে শাম, তুমি পুণ্য! সাহাবীরা আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, এমন করে শামের প্রশংসা করছেন-যে! তিনি তখন বললেন—ওই যে ফেরেশতারা ডানা মেলে আছে শামের উপর! [তিরমিযি]

‘আল কারিম ইবনুল কারিম ইবনিল কারিম ইবনিল কারিম—

ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনি ইসহাক ইবনি ইবরাহিম’

সুরা ইউসুফ পড়তে বসলে অজান্তেই মন চলে যায় ফিলিস্তিনে । কেমন ছিলো নবী-ইয়াকুবের পরিবার? ইউসুফের বৈমাগ্রেয় ভাইয়েরা কেনো হিংসা করতো ছোট্টো ইউসুফকে? তখন মনে কতোবার উঁকি দেয়—আহা, যদি যেতে পারতাম নবী-গৃহের পুণ্য আবহের সেই জায়গাটিতে একটি বার!

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কোথায় হাঁটতেন
ছোট্টো ইউসুফের হাত মুঠোয় করে? কোন্
পাথরখণ্ডে বসে বসে তিনি ইউসুফকে
শোনাতেন পূর্বপুরুষের গৌরবের কাহিনি?
কোথায় ছিলো সেই বনটা?

